প্রিয় পদরেখা

মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী
লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক-সম্পাদক, দার্শনিক আলেমে দীন
ইতিহাস, রাষ্ট্র ও সমাজতত্ত্ববিদ

প্রকাশনায়
রাহনুমা প্রকাশনী ™

সূচিপত্র

হিমালয়ের পায়ের কাছে—১৩
আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.

উষ্ণ হৃদয় ও দৃপ্ত চেতনার স্বাপ্নিক—৩৪
আল্লামা সুলতান যওক

বটবৃক্ষের ছায়া সুশীতল—৪৫
মাওলানা মুহিউদ্দীন খান

হাফেজ্জী হুজুরকে ঘিরে স্মৃতির বিস্রস্ত পত্র—৭৬

বাংলার শাইখুল হাদীস পূর্ণতার প্রতিচ্ছবি—৮৮
শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ.

ময়মনসিংহ নামটি শুনলেই যার মুখ ভেসে উঠে চোখে—৯৫
মাওলানা হাফেজ ফয়জুর রহমান সাহেব রহ.

যে বার্তা রেখে গেলেন মুফতী আমিনী—১০১

আমার স্মৃতিতে ফকীহুল মিল্লাত—১০৮
মুফতী আব্দুর রহমান রহ.

এই যামানায় স্বর্ণযুগের মানুষ—১২৪
শাইখুল হাদীস আল্লামা এহসানুল হক সন্দ্বীপী রহ.

চলে গেলেন হযরত শাহ জালাল রহ.-এর এক জীবন্ত প্রতিনিধি—১৩৩
হাফেজ মাওলানা আকবর আলী রহ.

অনিঃশেষ পলায়ন—১৩৮
শায়খুল হাদীস আল্লামা ইসহাক গাজী রহ.

সতীর্থদের ভালোবাসায় তিনি অমর হয়ে থাকবেন—১৪৪
আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী রহ.

আবেগ আর প্রত্যয়ে ভরা দীপ্তিময় দুটি চোখ—১৪৮
অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারুক রহ.

কালের কপোলতলে স্নিগ্ধ হাসির ঝিলিক—১৫৫
মাওলানা হারূন ইসলামাবাদী রহ.

মাটি মানুষ ও প্রকৃতির আপনজন—১৬৪
শায়খ নূরুদ্দীন গহরপুরী রহ.

শতাব্দীর পথযাত্রায় এরাই রাহনুমা—১৭৩
মাওলানা মাহমূদুর রহমান রহ.

শ্যামল বাংলায় ভূস্বর্গের ছায়া—১৭৬
মাওলানা সৈয়দ মুসলেহুদ্দীন রহ.,
আল্লামা ইমাম আহমদ রহ. এবং
মাওলানা রিয়াসত আলী রহ.

যেকোনো সুবাদে সম্পর্ক জুড়তে পারাটাই যেখানে সৌভাগ্য—১৮২
মাওলানা মুহিব্বুর রহমান রহ.

অনুসরণীয় প্রিয় পদরেখা, শ্যামল বাংলার সৌন্দর্য—১৮৭
আল্লামা সিরাজুল ইসলাম রহ.

নিভৃতচারী এক মানবরত্ন : হাফেজ ওমর রহ.—১৯১
ইবনে সদর সাহেব হুযুর রহ.

আমার দোস্ত আমার শায়খ—১৯৭
শায়খুল হাদীস আল্লামা কুতুবুদ্দীন রহ.

হিমালয়ের পায়ের কাছে

ইসলামী শিক্ষা, আদর্শ ও ঐতিহ্যের এক জীবন্ত নমুনা। ভ্রাম্যমাণ এক জ্ঞানের পৃথিবী। পূর্ববর্তী যুগের সাধক মনীষীবর্গের প্রতিচ্ছবি। নবীবংশের উত্তরপুরুষ। ভারতীয় উপমহাদেশের অনন্য ইসলামী প্রতিভা। বিরলপ্রজ মনীষা। বিশ্ব ইসলামী সাহিত্য আন্দোলনের স্থপতি। জাগরণের পার্থসারথি। অসাধারণ প্রজ্ঞা, সাত্ত্বিকতা আর পূত চরিত্রের ধারক। তাপস সম্রাট। শতাব্দীর অন্যতম সেরা ইসলামী চিন্তানায়ক আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভীর নামের শেষে গত ১৯৯৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর থেকে 'রহমাতুল্লাহি আলাইহি' বলতে শুরু করেছি আমরা। বড় কষ্টের ছিল এ দিনটি পূর্ব ও পশ্চিম গোলার্ধে বসবাসরত বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর জন্যে। সচেতন ব্যক্তিরা তো চরম শোকাভিভূত। বাংলাদেশের হাজার হাজার পাঠক, ভক্ত, অনুরাগী ও হাতেগোনা কিছু শাগরেদের সাথে আমিও সীমাহীন বেদনাভারাক্রান্ত। নবী-নন্দিনী হযরত ফাতিমা যাহরা রাযি. তাঁর পিতা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহাপ্রয়াণে স্বরচিত যে শোকের কবিতা পড়েছিলেন, আমার স্মৃতিতে এখন সে ঐতিহাসিক কবিতার এ পঙ্‌ক্তিটাই জ্বলজ্বল করছে।

صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الأیام صرن لیالیا

অর্থাৎ, আব্বাজির মৃত্যুতে আমার ওপর যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে, দিবসের ওপর যদি এ শোক আরোপ করা হয় তবে দিবস চিরতরে রজনীতে পরিণত হবে।

হযরত আল্লামা রহ.-এর ইন্তেকাল গোটা মুসলিম জাতি আজ অভিভাবকহারা। মাথার ওপর থেকে মহান এক মুরব্বির ছায়া অপসৃত হওয়ায় আমরাও খোলা আকাশের নিচে নিষ্ঠুর বিয়াবানে পড়ে গেছি। তাঁর সাথে

আমার সম্পর্ক পায়ের সাথে ধুলার সম্পর্কের চেয়ে বেশি নয়। তাকওয়া, ইখলাস, সুমধুর চরিত্র, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার এ হিমালয়ের পায়ের স্পর্শে আসতে পেরে মনে হয় যেন 'সাত রাজার ধন' পেয়েছি। তাঁর সংস্পর্শে সুবাসিত যত মাটির ঢেলা তাদের সাথেই বা কী তুলনা এ নিকৃষ্ট পদরেণুর। তবুও ভেবে আনন্দে নেচে ওঠে মন যে অন্তত মহান ব্যক্তির পায়ের সাথে জুতার ফিতারও তো একটা গর্বের সম্পর্ক থাকে। যে কয়টা দিন কাছে থেকে তাঁকে দেখেছি, সেসব দিনের স্মৃতিও এ ক্ষুদ্র পরিসর নিবন্ধে তুলে ধরা সম্ভব নয় আর তাঁর কর্মবহুল বর্ণাঢ্য জীবনসাধনা, সে তো বহুদূর।

অনুর্ধ্ব বিশ সে পুণ্যময় যুবক। যাকে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী পত্র লেখেন, খেতাব করেন, 'জামেউল কামালাত' বা 'সকল কৃতিত্বের আধার' বলে, একি চাট্টিখানি কথা! একই সাথে চার চারজন যুগশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক দীক্ষাগুরুর খেলাফতপ্রাপ্তি কি অতি সহসা খুঁজে পাবে কেউ আধ্যাত্মিকতার ইতিহাসে? এ কেমন বিস্ময়কর প্রতিভা, মাত্র ২৫ বছর বয়সে রচিত যাঁর গ্রন্থ (*islam and the world*) গোটা বিশ্বে অনূদিত হয়ে Best seller -এ পরিণত হয়। যে বই হাতে নিয়ে বৃটিশ হাউস অব কমন্সে পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলতে হয়, 'যুক্তরাজ্যে লেখকের স্বাধীনতা পূর্ণরূপে স্বীকৃত না হলে এবং বৃটেনে কোনো বই প্রবেশ নিষিদ্ধ করার আইনগত সুবিধা থাকলে আমি একটি বই নিষিদ্ধ করার সুপারিশ এ হাউজে পেশ করতাম। বইটি হলো ভারতীয় লেখক আবুল হাসান আলী নদভী রচিত *islam and the world* কোন সে তরুণ যাঁকে একনজর দেখার জন্যে, হৃদয়ে বরণ করার জন্যে রাবাত থেকে জাকার্তা পর্যন্ত গোটা মুসলিম জাহান চোখের পলক বিছিয়ে প্রতীক্ষার দিন গোনে? মিসরের শহীদ হাসান আল-বান্নার ডায়েরি প্রকাশের সময় ইখওয়ান নেতারা যে ভারতীয় মনীষীর পবিত্র হাতের 'ভূমিকা' পেতে চায়। যে নওজোয়ান ইসলামী লেখক-চিন্তাবিদের দেখা পেয়ে শহীদ বান্নার বৃদ্ধ পিতা শায়খ আব্দুর রহমান সাআতী বুকে জড়িয়ে ধরে দুআ করেন। ভুলে যেতে পারেন পুত্রশোক। যাঁর খেলাচ্ছলে লেখা 'গল্পগ্রন্থ' *কাসাসুন্নাবিয়্যীন* চিরদিনের জন্যে গোটা বিশ্বময় পাঠ্যসূচিভুক্ত হয়ে সমাদৃত হয়। নিজ কিশোর ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্যে লেখা বই পায় দামেশক আরবী একাডেমি পুরস্কার।

যে মনীষীর প্রতিটি কথা হয় গ্রন্থিত। প্রতিটি বক্তৃতার হয় সংকলন। রচিত পুস্তক হয় চিরন্তন-সাহিত্য। চিন্তার প্রতিটি ক্ষণ হয়ে ওঠে দিব্যদৃষ্টির বারতা। উপলব্ধি ও মূল্যায়ন হয় ইতিহাসের আকরিক পথ-নির্দেশ। যে মনীষীর জীবন শুরু হয় ভীষণ দারিদ্র্যের ভেতর দিয়ে। পরিণত বয়সে বিত্তের ঢল নামলেও আমৃত্যু অতি সতর্কভাবে যিনি গলায় জড়িয়ে রাখেন সে গৌরবময় দারিদ্র্যকে। কৈশোরে পিতৃহীন যে বালক বড় ভাই ডা. সাইয়েদ আবদুল আলীর তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠেন, কে জানত এ বালকই একদিন হবেন আধুনিকবিশ্বের চিন্তা, গবেষণা, ইসলামী জাগরণ আর কর্মসাধনার অন্যতম প্রাণপুরুষ।

রাবেতার প্রতিষ্ঠাতা পরিষদের সদস্যরূপে যিনি মুসলিমবিশ্ব ভ্রমণ করে বই লেখেন, *দরিয়ায়ে কাবুল সে দরিয়ায়ে ইয়ারমুক তক*। মধ্যপ্রাচ্যে সফর করে লেখেন, *শারকে আওসাত কী ডায়েরি*। আমেরিকায় বক্তৃতা দিলে যার সংকলিত কিতাবের নাম হয় *নয়ী দুনিয়া আমেরিকা সে কুচ্ছ সাফ সাফ বাতেঁ* লন্ডনে গিয়ে যিনি অক্সফোর্ডে প্রথমবারের মতো প্রতিষ্ঠা করেন ইসলামিক স্টাডিজ সেন্টার। স্বাধীন মধ্য এশিয়ায় স্থাপন করেন মাদরাসায়ে ইমাম বুখারী রহ.। অস্ট্রেলিয়া, জাপান কোথায় তাঁর কাজের ছোঁয়া নেই। ইউরোপ-আফ্রিকায় কী পরিমাণ তাঁর প্রতিপত্তি! অন্তত পাঁচশ মূল্যবান রচনা যার শত ভাষায় অনূদিত হয়ে ছড়িয়ে আছে এ মানবীয় গ্রহে।

পৃথিবীব্যাপী ঘুরে বেড়ানো এ মনীষীর যখন দেশে থাকার সময় হতো তখন গোটা ভূ-ভারতের শত সহস্র তৃষিত চাতক ঘিরে ধরত তাঁকে, জ্ঞানবারিতে সিঞ্চিত হওয়ার প্রবল আশায়। বড় বড় রথি-মহারথির ভিড় গলিয়ে, বড়দের পাত্র উপচে এ দিবাকরের আলোক-আভা এই ধূলিকণাকেও স্পর্শ করত। পার্থিব এই জীবনে এ স্মৃতি আজ ভীষণ মহার্ঘ।

বিদেশ থেকে নদওয়ায় ফিরে একদিন বাংলাদেশি ছাত্রদের ডেকে বললেন, সাধারণত তিনি ছোট বড় সবাইকে 'আপনি' বলেই সম্বোধন করতেন, 'আপনাদের কোনো কষ্ট হচ্ছে না তো?'

বললাম, 'কোনো কষ্ট নেই, যথেষ্ট আরামে আছি আমরা।'

হেসে বললেন, এখানে তো রুটি খেতে হয়, ভাত না খেতে পেরে নিশ্চয়ই কষ্টে আছেন?

বললাম, 'বিদেশি ছাত্রদের জন্যে এখানে ভাতেরও ব্যবস্থা আছে, আমরা অবশ্য শখ করে মাঝে মাঝে রুটিও খাই।'

এবার বললেন, 'মাছ তো নিশ্চয়ই দেওয়া হয় না। কেবল গোশত আর গোশত। মাছ খাওয়ার জন্যে বাঙালিদের আমি দাওয়াত করলাম। আপনারা আমার অফিস থেকে টাকা নিয়ে একদিন মাছ খাবেন।'

নদওয়ায় সেক্রেটারিয়েট থেকে টাকা নিয়ে আমরা আরও টাকা মিলিয়ে অনেক মাছ কিনলাম। নানা রকম পদ্ধতিতে মাছ পাকালেন বাংলাদেশি কয়জন সাথী। রাতে খাওয়ার সময় ডিশভর্তি মাছ নিয়ে আমরা চলে যাই নদওয়ার রেস্ট হাউজে, যেখানে হযরত আল্লামা অধিকাংশ সময় অবস্থান করতেন। খুব খুশি হলেন তিনি। লোক পাঠিয়ে ক্যাম্পাস থেকে বেশ কয়জন সিনিয়র অধ্যাপক ও কর্মকর্তাকে মৎস-ভোজনে অংশ নিতে ডাকলেন। খুব তৃপ্তিসহকারে সেদিন আমরা আমাদের জীবনের একটি স্মরণীয় ডিনার উপভোগ করি। এত বিরাট ব্যক্তিত্ব অথচ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়েও কী পরিমাণ মনোনিবেশ। কী দারুণ চরিত্রমাধুরী! নবীজির উত্তরপুরুষের জীবনে যেন পাক নবীজির আদর্শেরই পূর্ণ প্রকাশ।

হঠাৎ করেই দেখতাম রেস্ট হাউজে নানা হোমরা-চোমরার আনাগোনা। কী ব্যাপার! খাদ্যমন্ত্রী এসেছেন পরামর্শ করতে। গভর্নর কিছু বলতে এসেছেন। নদওয়ার ক্যাম্পাসে লোকসভার ভাইস চেয়ারপার্সন ডা. নাজমা হেপাতুল্লাহর গাড়ি দাঁড়িয়ে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা মাওলানা আবুল কালাম আজাদের নাতনি এই জাঁদরেল পার্লামেন্টারিয়ান কথা বলতে চান ভারতীয় মুসলিম স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোনো প্রসঙ্গে। হেলিকপ্টার নামিয়ে নদওয়ার মাঠে হাঁটাহাঁটি করেছেন প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী বা কেন্দ্রীয় কোনো মন্ত্রী। গতি তাঁদের আল্লামা নদভীর কক্ষপানে। ইন্দিরা গান্ধী নদওয়ায় আসছেন বলে খবর পেয়ে আল্লামা সাক্ষাৎ দিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করলেও প্রধানমন্ত্রী ভীষণ জরুরি মনে করে হেলিকপ্টার হাঁকান লখনৌর আকাশে। আল্লামাকে তখন ছুটে পালাতে দেখা যায় রায়বেরেলির গ্রামের বাড়িতে। ও আল্লাহ! সেখানেও পৌঁছে যায় প্রধানমন্ত্রীর কপ্টার। রায়বেরেলির সড়কের নামকরণ হয় 'আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভী আলী মিয়া মার্গ' বা আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভী ওরফে আলী মিয়া সড়ক। এভাবেই পালিয়ে বেড়ানো দরবেশকে জেঁকে

ধরতে হয় প্রয়াত রাজীব গান্ধীকেও। জীবনের শেষ বেলা হালকা প্যারালাইসিস আক্রান্ত হলে শয্যাপাশে হাজির হতে দেখা যায় অটল বিহারী বাজপেয়ীকে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'হযরত, আপনাকে দিল্লি নিয়ে উন্নত চিকিৎসা করাই। না কি বিদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করব?'

আল্লামা জবাব দেন, 'যদ্দিন হায়াত আছে লখনৌতেই থাকতে চাই। দাফন রায়বেরেলি হলেই খুশি হই। আল্লাহ যদি সুস্থ করতে চান তাহলে এখানেই করবেন।' বিফলমনোরথ প্রধানমন্ত্রী আশির্বাদ কামনা করে ফিরে যান।

এরপর আল্লামা অনেকটা সুস্থ হন। হুইল চেয়ারে বসে বা অন্যের সাহায্য নিয়ে চলতে-ফিরতেও পারতেন। এরই মধ্যে দুবাই সরকার দাওয়াত দেয় ১৯৯৮ সালের শ্রেষ্ঠ ইসলামী ব্যক্তিত্বরূপে তাঁকে সম্মান পুরস্কার, পদক ও সনদ প্রদান করা হবে। হযরত জবাব দেন, জীবনে কোনোদিনই তো পদক বা পুরস্কার আনতে তিনি কোথাও যাননি। সুতরাং দুবাই যাবেন না। দুবাই সরকার অনুরোধ পাঠায়, 'হযরত, নবীন প্রজন্ম আপনাকে একনজর দেখতে চায় এবং একমুহূর্তের জন্যে হলেও সান্নিধ্যের সৌভাগ্যপ্রত্যাশী।' এরপরও তিনি দুর্বলতা ও অসুস্থতার কারণ দেখালে সরকার টু সরকার কথা বলে সংযুক্ত আরব আমীরাত সরকার একটি বিশেষ বিমান সরাসরি দুবাই থেকে উত্তর ভারতের লখনৌ প্রেরণ করে, বিমানটি হযরতকে একবার নিয়ে যায় এবং অনুষ্ঠান শেষে এসে পৌঁছে দেয়। লখনৌ বিমানবন্দরটি আভ্যন্তরীণ। আন্তর্জাতিক নয়। দেশের বাইরে যাওয়ার জন্য জরুরি বহির্গমন অফিস এখানে নেই। আল্লামার জন্য ভারত সরকার লখনৌ এয়ারপোর্টকে ইন্টারন্যাশনাল মানে উন্নীত করে। ইমিগ্রেশনের সিল-ছাপ্পরসহ কর্মকর্তারা দিল্লী থেকে লখনৌ চলে আসেন। এমন নজির ভারতে আর কোনো ব্যক্তির বেলা পাওয়া যাবে কি না কে জানে! আমার তো ইতিহাসেই এ ধরনের কোনো নজির আছে জানা নেই। পরদিন গোটা বিশ্বমিডিয়ায় এ বিরল ঘটনাটি প্রচারিত হয়। *হিন্দুস্থান টাইমস* হেডিং করে, 'একজন ভারতীয় মুসলিম মনীষীর জন্যে আমাদের স্বাভাবিক বিমান চলাচল ব্যবস্থা রদবদল। সিডিউল পরিবর্তন এবং আকাশ নিরাপত্তাব্যবস্থা পুনর্বিন্যাস।'

তাঁর ওফাতের রমযানে হযরতের সাথে ইতেকাফ করার লক্ষ্যে অসংখ্য বাংলাদেশি ভক্ত ভিসার আবেদন করে। কিন্তু বিপুলসংখ্যক দর্শনার্থী ভিসা

লাভে ব্যর্থ হয়ে শোকাশ্রু ঝরায়। কয়েকজন ভিসা লাভ করে ছুটে যান রায়বেরেলি। কিন্তু তারা তখন জানতেন না যে এবারই হযরতের শেষ রমযান। ২৩ রমযানেই তিনি ওফাত পাবেন। ভিসা না পাওয়া দলের আমি পুরোনো হতভাগা। জ্ঞাতি ভাই আরিফ মুহাম্মদকে সালাম পৌঁছে দেওয়ার কথা বলে বিদায় করি। চোখের সামনে দিয়ে চলে যান প্রফেসর ওমর আলী আর বন্ধুবর ড. আনওয়ারী। যখন ফিরে আসেন তখন তাঁদের চোখে অশ্রু। আমার পাথর হয়ে যাওয়া মূক অনুভূতি তো বহু আগেই রক্তাশ্রু প্রবাহিত করে নিথর হয়ে গেছে।

'রগো পে দৌড়ে ফিরনে কে হাম নেহি কায়েল। আঁখোঁ সে না টপকে তো ফের লহু কেয়া হ্যায়।'

দেহের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হওয়ার সমর্থক বাবা আমি নই, অনুভূতি মথিত করে চোখ বেয়েই যদি না পড়বে তো আবার রক্ত কিসের?

উর্দুর শ্রেষ্ঠ কবি মির্জা আসাদুল্লাহ খাঁ গালিবের এ দুটো পঙ্‌ক্তি দিয়েই ভাব প্রকাশ করতে হয়। সত্যিই শরীরের রক্ত যে অশ্রু হয়ে প্রবাহিত হতে পারে আল্লামার বিরহব্যথা অনুভবের আগে এ কথা ভালো করে বুঝে আসত না। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতে উচ্চাসন দান করুন। মুসলিম উম্মাহকে দিন তাঁর যোগ্য উত্তরসূরি।

জাহেলী যুগে একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র কাবাগৃহের চাবি চেয়ে ব্যর্থ হন। ওসমান ইবনে তালহা তখন তাঁকে চাবি দেয়নি। হযরত মনে কষ্ট পেলেও কিছু না বলে সবর করেন। এর কয়বছর পরই বিজয়ীর বেশে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দিন মক্কা নগরীতে প্রবেশ করেন তখন মাথা নত করে তাঁর হাতে চাবিটি অর্পণ করে পরাজিত ওসমান ইবনে তালহা। তার হাত থেকে চাবিখানা নিয়ে কাবা গৃহ খুলে প্রবেশ করেন হযরত। অতঃপর চাবি কাকে অর্পণ করবেন, এ নিয়ে ভাবছিলেন। প্রত্যাশার চোখ নিয়ে অনেক বড় বড় সাহাবীই প্রতীক্ষায়। প্রিয় রাসূল সবাইকে অবাক করে দিয়ে চাবিটি প্রত্যর্পণ করলেন ওই ওসমান ইবনে তালহার হাতেই। বিস্ময়ে বিস্ফোরিত তাঁর দু-নয়ন। এও কি সম্ভব! শুধু তাই নয়, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথাও বললেন, 'এ

চাবি কিয়ামত পর্যন্ত তোমার বংশধরের হাতেই থাকবে। কোনো অত্যাচারী ব্যক্তিই কেবল তা ছিনিয়ে নিতে পারে, অন্য কেউ নয়।'

সত্যিই দীর্ঘ দেড় হাজার বছর যাবত এ বংশের হাতেই পবিত্র কাবার চাবি। দীর্ঘ ইতিহাসে সম্মানসূচকভাবে এ চাবি প্রদান করা হয় যে ক'জন হাতেগোনা মানুষকে স্মরণকালের মধ্যে এর একজন ছিলেন শহীদ বাদশাহ ফয়সল। অপরজন আমাদের উপমহাদেশ তথা গোটা অনারব পৃথিবীর গৌরব আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.। আল্লাহ পাক তাঁকে কত বড় সম্মানে ভূষিত করেছিলেন তা কল্পনা করতেও আমাদের স্নায়ু ক্লান্ত হয়ে আসে। শুধু তা-ই নয়, গত ২৩ রমযান (৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৯) ইন্তেকালের খবর মক্কা-মদীনায় পৌছলে, সেখানকার শাসকবর্গ ২৭ রমযান বাদ তারাবীহ মক্কা ও মদীনার পবিত্র দুই হরম শরীফে আল্লামা নদভীর গায়েবানা জানাযা আদায়ের ব্যবস্থা করেন। বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ওমরা ও ইতেকাফের উদ্দেশ্যে সমবেত লক্ষ লক্ষ মানুষ শরীক হন এতে। কী অপূর্ব সম্মাননা ও সৌভাগ্য!

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম স্বপ্নদ্রষ্টা এই মনীষীর জীবদ্দশায়ই তাঁর নামে মদীনা শরীফে সড়কের নামকরণ করা হয়। শত শত নিবন্ধ ও কথিকা তাঁর প্রচারিত হয় মধ্যপ্রাচ্যের অসংখ্য রেডিও টিভি সম্প্রচারকেন্দ্র থেকে। সাক্ষাৎকারের তো সীমাই নেই। একবার মিসরীয় এক দৈনিক দেখেছিলাম আল্লামার সাক্ষাৎকারের শিরোনামই ছিল 'আশ শায়খ আন নাদওয়ী য়ুহাররিমুস সূরাহ হাত্তাল আন'-'আশ শায়খ আন নদভী আজও পর্যন্ত প্রাণী চিত্রচর্চাকে হারাম মনে করেন।'

আগামী দিনের বিশ্বব্যবস্থারূপে ইসলামী চিন্তা-চেতনার অন্তর্নিহিত প্রতিপত্তি হযরতের বই 'ইলাল ইসলাম মিন জাদীদ' তথা *again towards islam* পড়লে মনে হয় একজন মোজাদ্দেদ ছাড়া এসব কথা কেউ ভাবতেই পারে না। ইসলামের দেড় হাজার বছরের ধর্মীয় সংস্কার ও জাগৃতি আন্দোলনের ৫ ভল্যুম এবং আরও ৫ ভল্যুমের পরিশিষ্ট মনীষী জীবনচরিতে তিনি তুলে ধরেন। নিজের জীবনীটাও তিনি রচনা করে গেছেন *কারওয়ানে জিন্দেগী* নামে ৭ খণ্ডে। এর শেষ খণ্ড সম্ভবত পরবর্তী কেউ চূড়ান্ত করবেন। জীবনের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্বগুলো নিজে লিখতে বিব্রতবোধ করেছেন বলে ৭ খণ্ড